ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ২য় পত্র: আত তাফসীর বির রিওয়ায়াহ

مجموعة (ب) : الاسئلة الموجزة

খ অংশ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

(১৫টি প্রশ্ন হতে যে-কোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে; মান- ৫×১০=৫০)

سورة النور (সূরা আন নূর)

৮৯. لم سميت السورة بسورة النور؟ - بين - [কেন এ সূরাটির নাম সূরা নূর রাখা হয়েছে? বর্ণনা কর।]
৯০. ما الحكمة فى قوله تعالى "سورة انزلناها وفرضناها"؟ - بين - [আল্লাহ তায়ালার বাণী سورة انزلناها وفرضناها এতে কী হেকমত রয়েছে? বর্ণনা কর।]
৯১. ما المراد بالنور فى قوله تعالى "الله نور السموات والارض"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী الله نور السموات والارض-এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?]
৯২. كم قراءة فى لفظ "فرضنا"؟ اوضح معناه - [فرضنا শব্দটির কতটি কেরাত রয়েছে? এর অর্থ ব্যাখ্যা কর।]
৯৩. اذكر حد الزنا مع اختلاف الائمة بالاختصار - [ইমামগণের মতভেদসহ ব্যভিচারের হদ সংক্ষেপে উল্লেখ কর।]
৯৪. بين حكمة تقديم الزانية على الزانى فى الاية - [আয়াতে নারী ব্যভিচারীকে পুরুষের আগে উল্লেখ করার হেকমত বর্ণনা কর।]
৯৫. اشرح قوله تعالى "فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" - [আল্লাহ তায়ালার বাণী فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة-এর ব্যাখ্যা কর।]
৯৬. اشرح قوله تعالى "ولا تأخذكم بهما رافة فى دين الله" - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ولا تأخذكم بهما رافة فى دين الله-এর ব্যাখ্যা কর।]
৯৭. بين سبب نزول قوله تعالى "الزانى لا ينكح الا زانية" - [আল্লাহ তায়ালার বাণী الزانى لا ينكح الا زانية এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বর্ণনা কর।]

৯৮. ما معنى الزنا لغة وشرعا؟ - [زنا শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?]
৯৯. ما المراد بقوله تعالى "ايات بينات"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ايات بينات-এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?]
১০০. بين معنى السورة لغة واصطلاحا؟ - [السورة-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? বর্ণনা কর।]
১০১. ما معنى القذف وما حده؟ - بين [قذف শব্দের অর্থ ও তার শাস্তি কী? বর্ণনা কর।]
১০২. ما معنى المحصنات؟ - [المحصنات শব্দের অর্থ কী?]
১০৩. ما حكم نكاح الزانى والزانية؟ - [ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহের শরয়ী বিধান কী?]
১০৪. هل يجوز قبول شهادة المحدود فى القذف بعد التوبة؟ - [অপবাদরদের কারণে শরয়ী প্রাপ্ত ব্যক্তির তওবার পর তার সাক্ষ্য কি গ্রহণযোগ্য?]
১০৫. ما معنى اللعان؟ بين حكمه - [لعان শব্দের অর্থ কী? এর শরয়ী বিধান বর্ণনা কর।]
১০৬. ما الفرق بين الافك والافتراء؟ - [افتراء ও افك-এর মধ্যে পার্থক্য কী?]
১০৭. اشرح قوله تعالى "لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم" - [আল্লাহ তায়ালার বাণী لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم-এর ব্যাখ্যা কর।]
১০৮. ما المراد بقوله تعالى "فشهادة احدهم اربع شهدات"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী فشهادة احدهم اربع شهدات-এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?]
১০৯. ما معنى العصبة؟ من هم المراد بها؟ - [العصبة শব্দের অর্থ কী? এর দ্বারা কাদের বোঝানো হয়েছে?]
১১০. بين معنى قوله تعالى "ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم" - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم-এর অর্থ ব্যাখ্যা কর।]
১১১. من هم المحروم للمرأة؟ - [নারীর জন্য স্থায়ীভাবে মাহরাম কারা?]
১১২. ما معنى الاستيذان؟ - [الاستيذان শব্দের অর্থ কী?]
১১৩. ما هو حكم السلام وجوابه؟ - [সালামের বিধান ও এর জবাবের হুকুম কী?]

১১৪. ما المراد بقوله تعالى "بيوتا غير مسكونة"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী بيوتا غير مسكونة-এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?]
১১৫. فى اى سنة فرض الحجاب؟ - [কোন সনে হিজাব ফরজ করা হয়েছিল?]
১১৬. ما معنى الحجاب؟ - [حجاب-এর অর্থ কী?]
১১৭. ما المراد بقوله تعالى "ويحفظوا فروجهم"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ويحفظوا فروجهم-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
১১৮. فسر قوله تعالى "الله نور السموات والارض" - [আল্লাহ তায়ালার বাণী الله نور السموات والارض-এর ব্যাখ্যা কর।]
১১৯. اشرح قوله تعالى "نور على نور" - [আল্লাহ তায়ালার বাণী نور على نور-এর ব্যাখ্যা কর।]
১২০. ما معنى البيع لغة وشرعا؟ - [بيع-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী?]
১২১. ما معنى الرزق لغة وشرعا؟ - [رزق-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী?]
১২২. اذكر اقوال العلماء فى كون الحرام رزقا - [হারাম জিনিস রিজিক হওয়ার বিষয়ে আলেমগণের অভিমত উল্লেখ কর।]
১২৩. ما معنى النفاق لغة وشرعا؟ - [نفاق-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী?]
১২৪. ما معنى الصلوة لغة وشرعا؟ - [صلوة-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী?]
১২৫. اشرح قوله تعالى "والله خلق كل دابة من ماء" - [আল্লাহ তায়ালার বাণী والله خلق كل دابة من ماء-এর ব্যাখ্যা কর।]

খ বিভাগঃ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (সূরা আন নূর)

৮৯. কেন এ সূরাটির নাম 'সূরা নূর' রাখা হয়েছে? বর্ণনা কর। (لم سميت السورة بسورة النور؟ - بين)

উত্তর:

ভূমিকা:

পবিত্র কুরআনের প্রতিটি সূরার নামকরণের পেছনে গভীর তাৎপর্য, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও হেকমত নিহিত থাকে। চব্বিশতম সূরা 'আন নূর'-এর নামকরণও এর মূল বিষয়বস্তু এবং এতে বর্ণিত একটি বিশেষ আয়াতের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সূরাটি মূলত অন্ধকার সমাজকে আলোকিত করার বিধানাবলিতে পরিপূর্ণ।

নামকরণের কারণসমূহ:

১. আয়াতুন নূর: এই সূরার ৩৫ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা নিজের সত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে এক অভাবনীয় ও আধ্যাত্মিক উপমা পেশ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

অর্থ: "আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের নূর (জ্যোতি)।"

এখানে আল্লাহর হেদায়েতের আলোকে প্রদীপ, কাঁচ ও জয়তুন তেলের এক চমৎকার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যেহেতু এই আয়াতে 'নূর' শব্দটি এবং এর তাৎপর্য অত্যন্ত গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে এবং এটি এই সূরার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাই সূরার নাম 'আন নূর' রাখা হয়েছে।

২. **সামাজিক অন্ধকার দূরীকরণ:** সূরাটি নাযিল হওয়ার আগে সমাজ ব্যভিচার, মিথ্যা অপবাদ, বেপর্দা ও অশ্লীলতার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা জিনার শাস্তি, পর্দার বিধান, অন্যের ঘরে প্রবেশের শিষ্টাচার এবং চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার কঠোর আইন নাযিল করেছেন। এই বিধানগুলো মেনে চললে একটি সমাজ জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়ে ইমানি আলোয় বা 'নূর'-এ উদ্ভাসিত হয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন মানবজীবনকে আলোকিত করার দিকনির্দেশনা থাকায় একে সূরা আন নূর বলা হয়।

উপসংহার:

যেহেতু এই সূরাটি আকিদাগতভাবে আল্লাহর পরিচয় (নূর) এবং আমলগতভাবে সমাজকে আলোকিত করার বিধান বহন করে, তাই এর নামকরণ 'সূরা আন নূর' অত্যন্ত যথার্থ ও অর্থবহ হয়েছে।

---

৯০. আল্লাহ তায়ালার বাণী "سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا" এতে কী হেকমত রয়েছে? বর্ণনা কর। (ما الحكمة فى قوله تعالى "سورة انزلناها وفرضناها"؟ بين -)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আন নূরের প্রারম্ভিক বাক্যটি কুরআনের অন্যান্য সূরার তুলনায় অনন্য ও ব্যতিক্রমী। আল্লাহ তায়ালা সচরাচর কোনো সূরার শুরুতে এভাবে 'ফরজ করেছি' শব্দটি ব্যবহার করেননি, যা এখানে করেছেন। এর পেছনে বিশেষ আইনি ও মনস্তাত্ত্বিক হেকমত রয়েছে।

আয়াতের অর্থ:

আল্লাহ তায়ালা বলেন: سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا

অর্থ: "(এটি) একটি সূরা, যা আমি নাযিল করেছি এবং একে ফরজ (আবশ্যক) করেছি।"

হেকমত ও তাৎপর্য:

১. বিধানের গুরুত্ব আরোপ: সাধারণত মানুষ নামাজ, রোজা বা হজ্জকে ফরজ ইবাদত মনে করে, কিন্তু সামাজিক আইন-কানুন বা পারিবারিক শিষ্টাচারকে (যেমন—পর্দা করা, অন্যের ঘরে প্রবেশের অনুমতি নেওয়া, জিনার বিচার করা) কিছুটা হালকাভাবে বা ঐচ্ছিক বিষয় মনে করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা সূরার শুরুতেই 'ফরাদনাহা' (আমি একে ফরজ করেছি) বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এই সূরায় বর্ণিত দণ্ডবিধি ও সামাজিক আইনগুলো পালন করা মুমিনের জন্য ঐচ্ছিক নয়, বরং নামাজ-রোজার মতোই অকাট্য ফরজ।

২. পরিবর্তনের অযোগ্যতা: এই সূরার বিধানগুলো 'হুদুদুল্লাহ' বা আল্লাহর সীমারেখা। এতে কোনো মানুষ, সমাজ বা রাষ্ট্র পরিবর্তন আনতে পারবে না। জিনার শাস্তি বা পর্দার বিধান কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত ফরজ হিসেবে বলবৎ থাকবে। কোনো আধুনিকতার দোহাই দিয়ে তা শিথিল করা যাবে না।

৩. কঠোরতা প্রদর্শন: এই সূরায় ব্যভিচার ও অপবাদের মতো কঠিন অপরাধের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। তাই শুরুতেই গম্ভীর ভাষায় অবতারণা করা হয়েছে যাতে মানুষের মনে আল্লাহর বিধানের প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়।

উপসংহার:

মূলত মুমিনদের মনমগজে এই সূরার বিধানগুলোর আবশ্যকতা গেঁথে দেওয়ার জন্যই আল্লাহ তায়ালা এমন প্রভাবশালী ভূমিকা দিয়ে সূরাটি শুরু করেছেন।

---

৯১. আল্লাহ তায়ালার বাণী "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ"-এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? (ما المراد بالنور فی قوله تعالی "الله نور السموات والارض"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আন নূরের ৩৫ নম্বর আয়াতটি 'আয়াতুন নূর' নামে পরিচিত। এটি কুরআনের অন্যতম রহস্যময়, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক আয়াত। এখানে আল্লাহ তায়ালা 'নূর' বা আলো রূপকের মাধ্যমে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন।

আয়াতের অর্থ:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ অর্থ: "আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের নূর (জ্যোতি)।"

তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা:

মুফাসসিরিনে কেরাম এই আয়াতের 'নূর' শব্দের ব্যাখ্যায় একাধিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন:

১. হেদায়েতকারী (আল-হাদি): রইসুল মুফাসসিরিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে 'নূর' অর্থ হলো হেদায়েতকারী বা পথপ্রদর্শক। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিনবাসীকে সত্য পথের দিশা দেন। তাঁর হেদায়েত ও ওহীর আলো ছাড়া গোটা সৃষ্টিজগত গোমরাহির অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকত। যেমন আলো ছাড়া পথ চলা যায় না, তেমনি আল্লাহর হেদায়েত ছাড়া সত্য পথে চলা অসম্ভব।

২. প্রকাশকারী (আল-মুজিদ/আল-মুজহির): ইমাম গাজ্জালি (রহ.) ও দার্শনিকদের মতে, নূর বলা হয় যা নিজে প্রকাশিত এবং অন্যকে প্রকাশ করে। আল্লাহ তায়ালা অস্তিত্বহীন জগতকে অস্তিত্ব দান করে আলোকিত করেছেন। তাঁর অস্তিত্বই সবকিছুর প্রকাশের মূল। তিনি না থাকলে মহাবিশ্ব অস্তিত্বহীনতার অন্ধকারে হারিয়ে যেত।

৩. ব্যবস্থাপক (আল-মুদাব্বির): কেউ কেউ বলেন, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের যে বাহ্যিক আলো আমরা দেখি, তা আল্লাহরই সৃষ্টি। তিনি এই আলো দিয়ে জগতকে আলোকিত ও সুশৃঙ্খল রেখেছেন।

উপসংহার:

মূলত এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, মুমিনের অন্তরে ঈমানের যে আলো জ্বলে এবং মহাবিশ্বে যে শৃঙ্খলা বিরাজমান, তা সবই মহান আল্লাহর নূরের প্রতিফলন।

---

৯২. "فَرَضْنَا" (ফারদনা) শব্দটির কতটি কেরাত রয়েছে? এর অর্থ ব্যাখ্যা কর। (كم قراءة فى لفظ "فرضنا"؟ اوضح معناه)

উত্তর:

ভূমিকা:

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন শব্দের উচ্চারণে বা পঠনশৈলীতে বৈচিত্র্য রয়েছে, যাকে 'ইলমুল কিরাত' বলা হয়। সূরা আন নূরের প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত 'ফারদনা' শব্দটিতেও একাধিক মশহুর (বিখ্যাত) কেরাত রয়েছে, যা অর্থের ব্যাপকতা বৃদ্ধি করে এবং আয়াতের মর্মার্থকে আরও গভীর করে তোলে।

কেরাত ও অর্থ:

এই শব্দটিতে প্রধানত দুটি কেরাত প্রচলিত আছে:

১. 'ফারাদনাহা' (فَرَضْنَاهَا) - তাশদিদ ছাড়া:

এটি জমহুর বা অধিকাংশ কারী ও ইমামের (যেমন—ইমাম নাফে, হাফস, হামজা, কিসাই ছাড়া অন্যরা) কেরাত।

অর্থ: 'আমি একে ফরজ করেছি' বা 'আমি একে আবশ্যক করেছি'।

এর দ্বারা বোঝানো হয় যে, এই সূরার হালাল-হারাম ও হদগুলো পালন করা মুমিনের ওপর বাধ্যতামূলক। এটি আল্লাহর অকাট্য হুকুম।

২. 'ফাররাদনা-হা' (فَرَّضْنَاهَا) - 'রা' হরফে তাশদিদসহ:

এটি ইমাম ইবনে কাসির ও ইমাম আবু আমর (রহ.)-এর কেরাত।

অর্থ: আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী 'তাফয়িল' বাব থেকে আসলে এর অর্থ হয়— 'আমি এতে বিস্তারিতভাবে বহু বিধান ফরজ করেছি' বা 'আমি এতে বিধানগুলোকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক পৃথক করে দিয়েছি'।

তাশদিদ আধিক্য ও বিস্তারিত বিবরণ বোঝায়। অর্থাৎ এই সূরায় একটি-দুটি নয়, বরং অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধান নাযিল করা হয়েছে এবং প্রতিটি বিধান সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

উপসংহার:

উভয় কেরাতের সারমর্ম হলো, সূরা আন নূরের বিধানগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত এবং অবশ্য পালনীয়। তাশদিদযুক্ত কেরাতটি বিধানের সংখ্যাধিক্য ও গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে।

৯৩. ইমামগণের মতভেদসহ ব্যভিচারের হদ (শাস্তি) সংক্ষেপে উল্লেখ কর। (اذكر حد الزنا مع اختلاف الائمة بالاختصار)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামী শরিয়তে ব্যভিচার বা জিনা একটি জঘন্য সামাজিক অপরাধ। সমাজকে কলুষমুক্ত ও বংশধারা পবিত্র রাখতে আল্লাহ তায়ালা এর জন্য কঠোর শাস্তি বা 'হদ' নির্ধারণ করেছেন। তবে অপরাধীর বিবাহিত বা অবিবাহিত হওয়ার ওপর ভিত্তি করে শাস্তির ধরণ ভিন্ন হয় এবং এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছু এখতেলাফ রয়েছে।

হদের বিবরণ ও মতভেদ:

১. অবিবাহিত (গাইরে মুহসান) ব্যভিচারী:

সকল ইমাম ও ফকিহ একমত যে, অবিবাহিত স্বাধীন নারী-পুরুষ জিনা করলে তাদের শাস্তি হলো ১০০ বেত্রাঘাত।

- **দলিল:** সূরা আন নূর, আয়াত ২: **فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ**।
- **মতভেদ:** ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে, ১০০ বেত্রাঘাতের সাথে এক বছরের জন্য দেশান্তর (নির্বাসন) বা জেল দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, দেশান্তর হদের অংশ নয়, বরং বিচারক চাইলে তা'যির (লঘু শাস্তি) হিসেবে দিতে পারেন।

২. বিবাহিত (মুহসান) ব্যভিচারী:

বিবাহিত ব্যক্তি জিনা করলে তার শাস্তি হলো রজম বা পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড।

- **দলিল:** এটি কুরআনে বর্তমানে পঠিত আয়াতে নেই, তবে বহু সহিহ হাদিস ও ইজমা (সাহাবিদের ঐকমত্য) দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল (সা.) মাঈজ আসলামি (রা.) ও গামিদিয়া গোত্রের নারীকে রজম করেছিলেন।
- **মতভেদ:** খাওয়ারিজ সম্প্রদায় এবং আধুনিক কিছু দল রজমের শাস্তি অস্বীকার করে। তাদের যুক্তি হলো, কুরআনে শুধু বেত্রাঘাতের কথা

আছে। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, তাদের এই দাবি বাতিল, কারণ সুন্নাহ কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।

উপসংহার:

ইসলামী রাষ্ট্রে আদালতের মাধ্যমে এই হদ কার্যকর হলে সমাজ থেকে অশ্লীলতা নির্মূল হয়।

---

৯৪. আয়াতে নারী ব্যভিচারীকে পুরুষের আগে উল্লেখ করার হেকমত বর্ণনা কর। (بين حكمة تقديم الزانية على الزانى فى الاية)

উত্তর:

ভূমিকা:

পবিত্র কুরআনে চুরির শাস্তির বর্ণনায় পুরুষের কথা আগে বলা হয়েছে (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ), কিন্তু সূরা আন নূরের ২য় আয়াতে জিনার শাস্তির ক্ষেত্রে নারীর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي)। কুরআনের শব্দচয়ন ও বিন্যাসের পেছনে আল্লাহ তায়ালার সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক হেকমত রয়েছে।

হেকমতসমূহ:

১. অপরাধের সূচনা ও প্ররোচনা: জিনার ক্ষেত্রে সাধারণত নারীদের সাজসজ্জা, বেপর্দা চলাফেরা বা সম্মতির বিষয়টি পুরুষের কামভাবকে উস্কে দেয়। আল্লামা যামাখশারি ও অন্যরা বলেন, নারীদের পক্ষ থেকে সুযোগ সৃষ্টি না হলে এবং তারা প্রশ্রয় না দিলে এই অপরাধ সংঘটিত হওয়া কঠিন। তাই অপরাধের কারণ বা উৎসের প্রতি ইঙ্গিত করে নারীকে প্রথমে সতর্ক করা হয়েছে।

২. লজ্জা ও পরিণাম: জিনার ফলে সামাজিকভাবে নারীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত হয়। অবৈধ সন্তান গর্ভে ধারণ করার কলঙ্ক তাকেই বহন করতে হয়, যা পুরুষের ক্ষেত্রে হয় না। পুরুষ অপরাধ করে লুকিয়ে যেতে পারে, কিন্তু নারীর গর্ভধারণ তার অপরাধ প্রকাশ করে দেয়। তাই এই ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নারীকে অধিকতর ভয় দেখানোর জন্য আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. কামশক্তির প্রাবল্য: প্রাচীন অনেক মনিষীর মতে, নারীদের কামশক্তি বা শাহওয়াত পুরুষের চেয়ে বেশি, কিন্তু লজ্জার কারণে তা দমিত থাকে। যখন সেই লজ্জা ভেঙে যায়, তখন তা ভয়াবহ রূপ নেয়। তাই তাদের সংযত করার জন্য আগে সম্বোধন করা হয়েছে।

উপসংহার:

নারী-পুরুষ উভয়েই সমান অপরাধী হলেও, অপরাধের প্রেক্ষাপট ও সামাজিক পরিণতির গুরুত্ব বিবেচনায় আল্লাহ তায়ালা এখানে নারীকে প্রাধান্য দিয়ে সতর্ক করেছেন।

---

৯৫. আল্লাহ তায়ালার বাণী "فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ"-এর ব্যাখ্যা কর। (اشرح قوله تعالى "فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة")

উত্তর:

ভূমিকা:

ব্যভিচার প্রতিরোধের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা যে দণ্ডবিধি ঘোষণা করেছেন, এটি তার মূল অংশ। এই আয়াতে অবিবাহিত জেনাকারীদের শারীরিক শাস্তির বিধান, পরিমাণ ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এটি শরিয়তের একটি অকাট্য হুকুম।

আয়াতের অর্থ:

আল্লাহ তায়ালা বলেন: فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

অর্থ: "সুতরাং তোমরা তাদের (ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের) প্রত্যেককে একশটি করে বেত্রাঘাত করো।"

ব্যাখ্যা ও মাসয়ালা:

১. শাস্তির পরিমাণ: অপরাধী যদি স্বাধীন, মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক এবং অবিবাহিত (মুহসান নয়) হয়, তবে তার শাস্তি নির্দিষ্টভাবে ১০০টি আঘাত। এর কম বা বেশি করা বিচারকের জন্য বৈধ নয়। এটি আল্লাহর হক।

২. প্রহারের পদ্ধতি: ফকিহগণের মতে, এই প্রহার এমন চাবুক বা বেত দিয়ে হতে হবে যা খুব বেশি শক্তও নয়, আবার খুব নরমও নয়। আঘাত খুব জোরে হবে না যাতে চামড়া ফেটে মাংস বেরিয়ে যায় বা হাড় ভাঙে, আবার এত আস্তেও হবে না যাতে ব্যথা না লাগে। একে 'দরবুন মুতাওয়াসসিত' (মধ্যম প্রহার) বলা হয়।

৩. সতর্কতা ও নিয়ম: প্রহার করার সময় শরীরের স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো (যেমন—মাথা, মুখমণ্ডল, লজ্জাস্থান) বাঁচাতে হবে। সারা শরীরে আঘাত ছড়িয়ে দিতে হবে, এক জায়গায় মারা যাবে না। পুরুষদের দাঁড় করিয়ে এবং নারীদের বসিয়ে (পর্দার সাথে) শাস্তি কার্যকর করার নিয়ম রয়েছে। শীত বা অতিরিক্ত গরমে শাস্তি কার্যকর করা হয় না।

উপসংহার:

এই কঠোর শাস্তির উদ্দেশ্য হলো অপরাধীকে পবিত্র করা এবং জনসমক্ষে শাস্তি দিয়ে অন্যদের শিক্ষা দেওয়া, যাতে সমাজে অশ্লীলতা না ছড়ায়।

---

৯৬. আল্লাহ তায়ালার বাণী "وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ"-এর ব্যাখ্যা কর। (اشرح قوله تعالى "ولا تأخذكم بهما رافة فى دين الله")

উত্তর:

ভূমিকা:

আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে মানুষের আবেগ বা দুর্বলতা যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সে জন্য বিচারকদের প্রতি এটি একটি কঠোর নির্দেশনা। অপরাধীর প্রতি দয়া যেন ন্যায়বিচারকে প্রভাবিত না করে, তা এখানে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আয়াতের অর্থ:

আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

অর্থ: "আল্লাহর দ্বীন (বিধান) কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের (অপরাধীদের) প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে স্পর্শ না করে।"

ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য:

১. আবেগ বনাম আইন: মানুষ স্বভাবতই অন্যের কষ্ট দেখলে দয়া অনুভব করে। বিশেষ করে অপরাধী যদি আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী বা সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হয়, তবে বিচারক বা শাসকের মনে হতে পারে—'আহা! ১০০টি বেত মারলে লোকটা মরে যাবে বা খুব কষ্ট পাবে, একটু কমিয়ে দিই।' আল্লাহ তায়ালা এই ধরনের দয়াকে নিষিদ্ধ করেছেন। একে 'রা'ফাত' বা কোমলতা বলা হয়েছে।

২. প্রকৃত দয়া: অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াই হলো প্রকৃত দয়া। কারণ এর মাধ্যমে সে দুনিয়াতে পবিত্র হয়ে যায় এবং আখেরাতের কঠিন আজাব থেকে মুক্তি পায়। দুনিয়ার সামান্য মায়া দেখাতে গিয়ে তার পরকাল ধ্বংস করা বোকামি। তাছাড়া অপরাধীকে ছেড়ে দিলে পুরো সমাজ কলুষিত হবে।

৩. ন্যায়বিচারের নিরপেক্ষতা: হযরত উমর (রা.) ও সাহাবিরা হদ কায়েম করার ক্ষেত্রে নিজেদের সন্তানকেও ছাড় দেননি। আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান—এই নীতিই এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপসংহার:

আল্লাহর হুদুদ বা দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে কোনো সুপারিশ বা মায়া-মমতার স্থান নেই। কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করাই ঈমানের দাবি এবং সমাজের নিরাপত্তার চাবিকাঠি।

---

৯৭. আল্লাহ তায়ালার বাণী "الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً" এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ (শানে নুজুল) বর্ণনা কর। (بين سبب نزول قوله تعالى "الزانى لا ينكح الا زانية")

উত্তর:

ভূমিকা:

পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত বিশেষ কোনো ঘটনা বা প্রশ্নের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, যাকে 'শানে নুজুল' বলা হয়। সূরা আন নূরের ৩য় আয়াতে ব্যভিচারী ও মুমিনদের বৈবাহিক সম্পর্কের বিধান বর্ণিত হয়েছে মক্কার একজন সাহাবির একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে।

শানে নুজুল (অবতীর্ণ হওয়ার কারণ):

হযরত মারছাদ ইবনে আবি মারছাদ আল-গানাবি (রা.) ছিলেন একজন শক্তিশালী ও সাহসী সাহাবি। তিনি মক্কা থেকে নির্যাতিত ও দুর্বল মুসলমানদের গোপনে পিঠে বহন করে মদিনায় নিয়ে আসতেন। ইসলাম গ্রহণের আগে জাহেলি যুগে মক্কায় 'আনাক' (عناق) নাম্নী এক সুন্দরী ব্যভিচারিণী নারীর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল।

একবার তিনি মক্কায় কোনো কাজে গেলে আনাকের সাথে দেখা হয়। আনাক তাঁকে পুরনো সম্পর্কের খাতিরে পাপ কাজের আহ্বান জানালে তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, "হে আনাক! আল্লাহ এখন এসব হারাম করেছেন।" তখন আনাক তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। হযরত মারছাদ (রা.) বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমতি ছাড়া বিয়ে করব না।"

মদিনায় ফিরে তিনি নবীজি (সা.)-কে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আনাককে বিয়ে করতে পারি?" তখন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন:

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً...

অর্থ: "ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে বিবাহ করে... আর মুমিনদের ওপর এটা হারাম করা হয়েছে।"

তাৎপর্য:

এই আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, একজন সচ্চরিত্র মুমিন পুরুষ জেনেশুনে কোনো দুশ্চরিত্রা নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। তাদের রুচি ও মর্যাদা এক নয়।

উপসংহার:

ইসলাম পবিত্র পারিবারিক বন্ধনকে উৎসাহিত করে। তাই জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীনদারিতা ও সচ্চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক।

৯৮. زنا শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? (ما معنى الزنا لغة وشرعا؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় 'জিনা' বা ব্যভিচারকে অন্যতম 'ফাহিশা' বা অশ্লীল কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি একটি কবিরা গুনাহ এবং সমাজ ধ্বংসকারী অপরাধ। এর সঠিক সংজ্ঞা জানা জরুরি, কারণ এর ওপর হদ বা শাস্তির বিধান নির্ভর করে।

আভিধানিক অর্থ:

আরবি 'জিনা' (الزِّنَا) শব্দটি সংকীর্ণতা বা পাপের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো ভাষাবিদ বলেন, এটি 'জানা' (زَنَى) ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ 'আরোহণ করা' বা 'উঠানো'। আবার কারও মতে এটি 'সংকীর্ণ হওয়া' (لِأَنَّهُ يَزْنِيْ فِي الْخُفْيَةِ - কারণ এটি গোপনে করা হয়) অর্থ বহন করে। বাংলায় এর অর্থ—ব্যভিচার, অবৈধ যৌনমিলন বা পাপাচার।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

শরিয়তের পরিভাষায়:

وَطْءُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فِي الْقُبُلِ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ وَلَا شُبْهَةِ نِكَاحٍ

অর্থ: "কোনো পুরুষের এমন নারীর সাথে সম্মুখদ্বারে (যৌনাঙ্গে) সঙ্গম করা, যার সাথে তার বিবাহবন্ধন নেই এবং বিবাহের কোনো সন্দেহও (মালিকানা বা ভুল ধারণা) নেই।"

শর্তসমূহ:

জিনার হদ বা শাস্তি সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কয়েকটি মৌলিক শর্ত রয়েছে:

১. নারী-পুরুষ উভয়ের প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া।

২. কর্মটি স্বেচ্ছায় করা (জোরপূর্বক বা ধর্ষণের শিকার হলে মজলুমের শাস্তি হবে না)।

৩. পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ (হাশাফা) নারীর গুপ্তাঙ্গে প্রবেশ করা।

৪. কাজটি হারাম জানা সত্ত্বেও করা।

উপসংহার:

জিনা কেবল শারীরিক সম্পর্ক নয়, বরং এটি বংশপরিচয় নষ্ট করে এবং পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে দেয়। তাই ইসলামে এর সংজ্ঞা ও শাস্তি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং কঠোর।

---

৯৯. আল্লাহ তায়ালার বাণী ايات بينات-এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? (ما المراد بقوله تعالى "ايات بينات"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আন নূরের প্রথম আয়াতেই আল্লাহ তায়ালা এই সূরার আয়াতসমূহের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে 'আয়াতুম মুবিনা' বা 'আয়াতুম বাইয়্যিনাত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটি কুরআনের বিধানের স্পষ্টতার দিকে ইঙ্গিত করে।

আয়াতের অর্থ:

আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

অর্থ: "এবং আমি এতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।"

তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা:

১. স্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থহীনতা: 'বাইয়্যিনাত' (بَيِّنَاتٍ) শব্দের অর্থ হলো সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল ও প্রকাশমান। এখানে এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, এই সূরায় বর্ণিত হালাল-হারাম, হুদুদ (দণ্ডবিধি) এবং আদব-কায়দাগুলো কোনো রূপক বা অস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়নি। ব্যভিচারের শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত, অপবাদের শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত, কিংবা অন্যের ঘরে প্রবেশের অনুমতি—এই বিধানগুলো এতটাই পরিষ্কার যে, তা বোঝার জন্য কোনো গভীর গবেষণার প্রয়োজন হয় না।

২. হেদায়েতের আলো: যেমন আলোতে সবকিছু পরিষ্কার দেখা যায়, তেমনি এই আয়াতগুলো মুমিনের জন্য সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য পরিষ্কার করে দেয়।

জাহেলিয়াতের যুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে এক পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ার জন্য এই আয়াতগুলো উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো।

৩. উপদেশ গ্রহণ: আল্লাহ আয়াতে বলেছেন 'যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো'। অর্থাৎ, আয়াতগুলো সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন সহজেই তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারে এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলে।

উপসংহার:

'আয়াতুন বাইয়্যিনাত' দ্বারা মূলত সূরা নূরের অকাট্য ও সুস্পষ্ট আইনি বিধানগুলোকে বোঝানো হয়েছে, যা মুমিনদের জীবন পরিচালনার মূল পাথেয়।

---

১০০. السورة-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? বর্ণনা কর। (ما معنى السورة لغة واصطلاحا؟ - بين)

উত্তর:

ভূমিকা:

পবিত্র কুরআন ১১৪টি ভাগে বিভক্ত, যার প্রতিটি ভাগকে 'সূরা' বলা হয়। কুরআনের অধ্যয়ন ও তাফসীর বোঝার জন্য 'সূরা' শব্দের বুৎপত্তিগত ও পারিভাষিক অর্থ জানা একান্ত প্রয়োজন।

আভিধানিক অর্থ:

আরবি 'সূরা' (السورة) শব্দটির মূলধাতু ও অর্থের ব্যাপারে ভাষাবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে:

১. উচ্চ মর্যাদা: শব্দটি 'সুর' (سور) থেকে নির্গত হতে পারে, যার অর্থ উচ্চ মর্যাদা বা টিলা। যেহেতু কুরআনের সূরাগুলো পাঠকের মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং ঐশী বাণীর উচ্চমার্গীয় স্থান দখল করে আছে, তাই একে সূরা বলা হয়।

২. প্রাচীর: এটি 'সুরুল মাদিনা' বা শহরের প্রাচীর থেকেও আসতে পারে। প্রাচীর যেমন একটি শহরকে ঘিরে রাখে এবং পৃথক করে, তেমনি সূরা তার আয়াতগুলোকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রাখে।

৩. অবশিষ্টাংশ: কারো কারো মতে এটি 'সু'রাহ' (سؤرة) থেকে এসেছে, যার অর্থ পানপাত্রের অবশিষ্ট পানি। যেহেতু প্রতিটি সূরা কুরআনের একটি অংশ বা খণ্ড, তাই এই নামকরণ।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

ইসলামী শরিয়ত ও উলুমুল কুরআনের পরিভাষায়:

السُّورَةُ هِيَ طَائِفَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ، لَهَا مَبْدَأٌ وَمَقْطَعٌ، وَأَقَلُّهَا ثَلَاثُ آيَاتٍ

অর্থ: "সূরা হলো কুরআনের আয়াতসমূহের এমন একটি নির্দিষ্ট সমষ্টি, যার একটি শুরু এবং একটি শেষ রয়েছে। এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো তিনটি আয়াত এবং সাধারণত এর একটি নির্দিষ্ট নাম থাকে (যা আল্লাহ বা রাসূল সা. কর্তৃক নির্ধারিত)।"

উপসংহার:

সূরা হলো ঐশী বাণীর এক একটি অধ্যায়, যা বিষয়বস্তু বা বিশেষ কোনো প্রসঙ্গের ভিত্তিতে সাজানো হয়েছে এবং যা মুমিনদের জন্য হেদায়েতের একেকটি সোপান।

---

১০১. قذف শব্দের অর্থ ও তার শাস্তি কী? বর্ণনা কর। (ما معنى القذف وما حده؟ - بين)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় মানুষের ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করা জান-মাল রক্ষার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। কারো চরিত্রে কালিমা লেপন করাকে ইসলামে 'কাজফ' বলা হয় এবং এর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

আভিধানিক অর্থ:

'কাজফ' (القذف) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো—জোরে নিক্ষেপ করা, ঢিল ছোড়া বা অপবাদ দেওয়া। যেহেতু অপবাদ আরোপকারী তার কথার মাধ্যমে

আক্রান্ত ব্যক্তির সম্মানের ওপর আঘাত হানে (যেন ঢিল মারে), তাই একে কাজফ বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থ:

শরিয়তের পরিভাষায়, কোনো সচ্চরিত্র বা 'মুহসান' নারী-পুরুষের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করা এবং সেই অভিযোগ প্রমাণে ৪ জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হওয়াকে কাজফ বলে।

কাজফের শাস্তি (হদ):

সূরা আন নূরের ৪ নম্বর আয়াতে অপবাদ আরোপকারীর জন্য তিনটি শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে:

১. শারীরিক শাস্তি: তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত (Jaldah) করতে হবে। এটি তার অপরাধের দুনিয়াবি কাফফারা।

২. নাগরিক অযোগ্যতা: তার সাক্ষ্য ভবিষ্যতে কখনো কোনো আদালতে বা বিচারকার্যে গ্রহণ করা হবে না। অর্থাৎ সে সামাজিকভাবে অবিশ্বস্ত বলে গণ্য হবে।

৩. ধর্মীয় শাস্তি: তাকে 'ফাসিক' বা পাপাচারী হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে, যতক্ষণ না সে খাঁটি দিলে তওবা করে।

উপসংহার:

বিনা প্রমাণে কারো চরিত্র হনন করা ইসলামে কবিরা গুনাহ। এই কঠোর আইন সমাজে গসিপ ও মিথ্যা অপবাদ ছড়ানো বন্ধ করতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

১০২. المحصنات শব্দের অর্থ কী? (ما معنى المحصنات؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আন নূরে এবং সূরা নিসায় 'মুহসানাত' শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিভাষা। প্রেক্ষাপট ভেদে এর অর্থের ভিন্নতা থাকলেও সূরা আন নূরের অপবাদের আয়াতে এর একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে।

আভিধানিক অর্থ:

'মুহসানাত' (المحصنات) শব্দটি 'হিসন' (حصن) বা দুর্গ থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো—দুর্ভেদ্য দুর্গে সুরক্ষিতা নারী, সতী-সাধ্বী নারী বা যে নারী নিজেকে অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে।

পারিভাষিক অর্থ (সূরা আন নূরের প্রেক্ষাপটে):

কাজফ বা অপবাদের আয়াতে (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) 'মুহসানাত' বলতে এমন নারীদের বোঝানো হয়েছে যাদের মধ্যে ৪টি গুণ বিদ্যমান:

১. স্বাধীন: দাসী নয়।

২. প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগা): অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু নয়।

৩. মুসলিম: অমুসলিম নয়।

৪. সচ্চরিত্রা (আফিফা): যারা ব্যভিচার থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং যাদের চরিত্রে আগে কখনো কোনো দাগ লাগেনি।

তাৎপর্য:

এই গুণসম্পন্ন কোনো নারীর বিরুদ্ধে যদি কেউ জিনার অভিযোগ আনে এবং প্রমাণ করতে না পারে, তবেই অভিযোগকারীর ওপর ৮০ দোড়রা বা 'হদ্দে কাজফ' ওয়াজিব হবে। এখানে 'মুহসানাত' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র নারীদের সম্মানকে দুর্গের মতো সুরক্ষিত ঘোষণা করেছেন।

উপসংহার:

'মুহসানাত' হলো সেই সব সম্ভ্রান্ত নারী, যাদের ইজ্জত আল্লাহর কাছে অত্যন্ত দামি এবং যাদের সম্মানহানি করা আল্লাহর গজব ডেকে আনে।

---

১০৩. ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহের শরয়ী বিধান কী? (ما حكم نكاح الزانى والزانية؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষায় ইসলাম সর্বদা সচেষ্ট। সূরা আন নূরের ৩য় আয়াতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহের প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে, যা ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা।

আয়াতের বক্তব্য:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

অর্থ: "ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে বিবাহ করে এবং ব্যভিচারিণী নারীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষ বিবাহ করে।"

শরয়ী বিধান:

এই আয়াতের হুকুম নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে:

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ও জাহেরি সম্প্রদায়: তাদের মতে, কোনো সচ্চরিত্র মুমিন পুরুষের জন্য কোনো ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করা হারাম, যতক্ষণ না সেই নারী খাঁটি দিলে তওবা করে। তওবা করার পর বিবাহ জায়েজ হবে।

২. ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও শাফেয়ি (রহ.): জমহুর ইমামদের মতে, এই আয়াতটি হারাম বোঝানোর জন্য নয়, বরং নিন্দা ও ঘৃণার জন্য নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ, একজন পবিত্র মুমিনের শানের খেলাফ হলো কোনো দুশ্চরিত্রাকে বিয়ে করা। তবে যদি কেউ বিয়ে করে ফেলে, তবে বিবাহ শুদ্ধ (সহিহ) হবে, কিন্তু কাজটি মাকরুহ বা অপছন্দনীয় হবে। বিবাহ বাতিল হবে না।

উপসংহার:

আয়াতের মূল শিক্ষা হলো, মুমিনদের উচিত জীবনসঙ্গী নির্বাচনে দ্বীনদারিতা ও চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়া। জেনেশুনে কোনো লম্পট বা দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে জীবনসঙ্গী করা মুমিনের কাজ নয়।

---

১০৪. অপবাদের কারণে শরয়ী দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির তওবার পর তার সাক্ষ্য কি গ্রহণযোগ্য? (هل يجوز قبول شهادة المحدود فى القذف بعد التوبة؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

মিথ্যা অপবাদ (কাজফ) দেওয়ার অপরাধে কাউকে যদি ৮০ বেত্রাঘাত করা হয়, তবে কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তার সাক্ষ্য আজীবন বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সে যদি পরবর্তীতে তওবা করে নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তবে কি তার সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্যতা ফিরে পাবে?

ইমামগণের মতভেদ:

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) - হানাফি মাজহাব:

ইমাম আজমের মতে, তওবা করার দ্বারা ওই ব্যক্তি আখেরাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে এবং আল্লাহ তাকে 'ফাসিক' বা পাপাচারীর তালিকা থেকে মুছে দেবেন। কিন্তু দুনিয়াতে তার সাক্ষ্য আর কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ আল্লাহ কুরআনে স্পষ্টভাবে বলেছেন, "তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না" (সূরা নূর: ৪)। এটি তার মিথ্যা বলার দুনিয়াবি শাস্তি, যা তওবা দ্বারা মাফ হয় না।

২. ইমাম শাফেয়ি, মালিক ও আহমদ (রহ.):

তাঁদের মতে, যদি ওই ব্যক্তি খাঁটি দিলে তওবা করে এবং তার আচরণের সংশোধন দেখা যায়, তবে তার সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণযোগ্য হবে। তাঁদের যুক্তি হলো, আয়াতে শাস্তির বর্ণনার পরপরই আল্লাহ বলেছেন, "তবে যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধন করে..." (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا)। এই 'ইস্তিসনা' বা ব্যতিক্রমটি সাক্ষ্য বাতিলের হুকুমকেও শিথিল করে দেয়।

উপসংহার:

হানাফি মাজহাবে অপরাধের গুরুত্ব ও মিথ্যার ভয়াবহতা বিবেচনা করে কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়েছে, যাতে কেউ ভবিষ্যতে কারো চরিত্রে মিথ্যা দাগ লাগানোর সাহস না পায়।

---

১০৫. لعان শব্দের অর্থ কী? এর শরয়ী বিধান বর্ণনা কর। (ما معنى اللعان؟ بين حكمه)

উত্তর:

ভূমিকা:

দাম্পত্য জীবনে স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ তোলে কিন্তু কোনো সাক্ষী না থাকে, তখন ইসলামি শরিয়ত 'লিআন' নামক এক বিশেষ বিচারিক পদ্ধতির বিধান দিয়েছে। এটি সূরা আন নূরের ৬-৯ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আভিধানিক অর্থ:

'লিআন' (اللعان) শব্দটি 'লা'নত' (اللعنة) মূলধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ অভিশাপ বা লানত দেওয়া। যেহেতু এই প্রক্রিয়ায় মিথ্যাবাদী হওয়ার শর্তে নিজের ওপর আল্লাহর লানত বা অভিশাপ কামনা করা হয়, তাই একে লিআন বলা হয়।

শরয়ী বিধান ও পদ্ধতি:

যদি স্বামী স্ত্রীর জিনার অভিযোগ আনে এবং ৪ জন সাক্ষী না থাকে, তবে কাজী বা বিচারক তাদের মসজিদে হাজির করবেন।

১. স্বামীর কসম: স্বামী আল্লাহর নামে ৪ বার কসম খেয়ে বলবে সে সত্যবাদী। ৫ম বার বলবে, "আমি মিথ্যাবাদী হলে আমার ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।"

২. স্ত্রীর কসম: এরপর স্ত্রী শাস্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য ৪ বার কসম খেয়ে বলবে স্বামী মিথ্যাবাদী। ৫ম বার বলবে, "স্বামী সত্যবাদী হলে আমার ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসুক।"

লিআনের ফলাফল:

উভয়ে কসম খাওয়ার পর বিচারক তাদের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। এই বিচ্ছেদ 'বাইনে কুবরা' বা চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ হিসেবে গণ্য হবে। তারা আর কখনো একে অপরকে বিয়ে করতে পারবে না। স্ত্রী হদের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে, কিন্তু পরকালের ফয়সালা আল্লাহর ওপর ন্যস্ত থাকবে।

উপসংহার:

লিআন হলো সাক্ষীবিহীন দাম্পত্য অপবাদের একমাত্র শরয়ী সমাধান, যা পারিবারিক সম্মান রক্ষা ও চূড়ান্ত বিচ্ছেদের মাধ্যম।

---

১০৬. افك ও افتراء -এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين الافك والافتراء؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আন নূরে মিথ্যা অপবাদের ঘটনায় 'ইফক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও সাধারণ অর্থে ইফক ও ইফতিরা—উভয়টিই মিথ্যা বোঝায়, কিন্তু আরবি ভাষাতত্ত্ব ও কুরআনিক ব্যবহারে এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।

১. ইফক (الإفك):

- **অর্থ:** 'ইফক' শব্দের মূল অর্থ হলো কোনো কিছুকে তার আসল রূপ থেকে উল্টে দেওয়া বা পরিবর্তন করা (Turning upside down)।
- **তাৎপর্য:** এমন জঘন্য ও ডাহা মিথ্যা, যা সত্যকে সম্পূর্ণ উল্টে দেয় এবং যা শুনেই মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। কুরআনে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে আনীত অপবাদকে 'ইফক' বলা হয়েছে, কারণ এটি ছিল পবিত্রতার বিপরীতে চরম কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা। এটি এমন মিথ্যা যার কোনো ভিত্তিই নেই।

২. ইফতিরা (الافتراء):

- **অর্থ:** 'ইফতিরা' শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছু কেটে নতুন রূপ দেওয়া বা মনগড়া কিছু রচনা করা (Fabrication)।
- **তাৎপর্য:** ইচ্ছাকৃতভাবে জেনেশুনে কোনো মিথ্যা তৈরি করা বা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করাকে কুরআনে সাধারণত 'ইফতিরা' বলা হয়েছে। এটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পার্থক্য:

ইফক হলো মিথ্যার চূড়ান্ত ও ভয়াবহ রূপ যা সত্যকে উল্টে দেয়, আর ইফতিরা হলো কৃত্রিমভাবে তৈরি করা মিথ্যা। হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘটনাটি এতটাই জঘন্য ছিল যে আল্লাহ একে সাধারণ মিথ্যা না বলে 'ইফক' বা 'মহা-অপবাদ' বলেছেন।

---

১০৭. আল্লাহ তায়ালার বাণী لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم-এর ব্যাখ্যা কর। (اشرح قوله تعالى "لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم")

উত্তর:

ভূমিকা:

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রা.)-এর ওপর মুনাফিকদের দেওয়া মিথ্যা অপবাদ (ইফক)-এর ঘটনায় মদিনার মুসলিম সমাজ এবং নবী পরিবার চরম মানসিক যন্ত্রণায় ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করে মুমিনদের সান্ত্বনা দিয়েছেন।

আয়াতের অর্থ:

"তোমরা এটাকে (অপবাদকে) তোমাদের জন্য অকল্যাণকর বা খারাপ মনে করো না, বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।" (সূরা আন নূর: ১১)

ব্যাখ্যা ও কল্যাণকর দিক:

আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটি ছিল সম্মানহানি ও কষ্টের, কিন্তু এর গভীরে ছিল অনেক কল্যাণ:

১. ঈমানের পরীক্ষা: এই ঘটনার মাধ্যমে আসল মুমিন (যারা সুধারণা পোষণ করেছিল) এবং মুনাফিকদের (যারা কুৎসা রটিয়েছিল) মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়। সমাজের আবর্জনা পরিষ্কার হয়।

২. পবিত্রতার সনদ: হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা কুরআনের প্রায় ১০/১৮টি আয়াত নাযিল করেছেন। এটি তাঁর এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরিবারের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত এক বিশাল সম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩. বিধান প্রণয়ন: এই ঘটনার ফলেই অপবাদের শাস্তি, সাক্ষী তলব এবং সামাজিক শিষ্টাচারের কঠোর বিধানগুলো নাযিল হয়েছে, যা কেয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর ইজ্জত রক্ষায় রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে।

উপসংহার:

আল্লাহ তায়ালা মন্দের ভেতর থেকেও ভালো বের করে আনেন। ইফকের ঘটনা বাহ্যত 'শর' (খারাপ) হলেও পরিণামে তা উম্মতের জন্য 'খায়ের' (কল্যাণ) বয়ে এনেছে।

---

১০৮. আল্লাহ তায়ালার বাণী "فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ"-এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? (ما المراد بقوله تعالى "فشهادة احدهم اربع شهدات"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

ব্যভিচারের অভিযোগ প্রমাণের জন্য ইসলামে ৪ জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে বাইরের সাক্ষী পাওয়া অসম্ভব। এই জটিলতা নিরসনে আল্লাহ তায়ালা 'লিআন'-এর বিধানে সাক্ষীর বিকল্প ব্যবস্থা করেছেন।

আয়াতের অর্থ:

"তাদের (স্বামীদের) কারো সাক্ষ্য হবে—আল্লাহর নামে চারবার সাক্ষ্য দেওয়া (শপথ করা)।"

উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

১. সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত: এখানে বোঝানো হয়েছে যে, লিআনের ক্ষেত্রে স্বামীর ৪টি কসম বা শপথ শরিয়তের দৃষ্টিতে ৪ জন চাক্ষুস সাক্ষীর সমতুল্য বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ, স্বামী যখন আল্লাহর নামে ৪ বার কসম খেয়ে বলে "আমি সত্যবাদী", তখন আদালত ধরে নেবে যে ৪ জন সাক্ষী উপস্থিত হয়েছে।

২. শাস্তি রদ: স্বামীর এই ৪টি শপথের কারণেই তাকে 'কাজিফ' বা মিথ্যা অপবাদকারী হিসেবে ৮০টি বেত্রাঘাত খেতে হবে না। তার শপথগুলোই তার সত্যতার প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হবে।

৩. গুরুত্ব: সাধারণ কসম আর এই কসম এক নয়। এই কসমের সাথে লানত বা অভিশাপ যুক্ত থাকায় এটি অত্যন্ত ভয়ংকর এবং এর আইনি ক্ষমতা প্রবল।

উপসংহার:

আল্লাহ তায়ালা দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা ও বাস্তবতাকে বিবেচনা করে স্বামীর ৪টি শপথকে ৪ জন সাক্ষীর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, যা ইসলামী আইনের প্রজ্ঞার পরিচায়ক।

১০৯. العصبة শব্দের অর্থ কী? এর দ্বারা কাদের বোঝানো হয়েছে? (ما معنى العصبة؟ من هم المراد بها؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আন নূরের ১১ নম্বর আয়াতে উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রা.)-এর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী দলকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা 'উসবাহ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শব্দটির আভিধানিক ও প্রাসঙ্গিক অর্থ জানা এই আয়াতের মর্মার্থ বোঝার জন্য জরুরি।

আভিধানিক অর্থ:

'আল-উসবাহ' (الْعُصْبَةُ) শব্দটি আরবি 'আছব' (عصب) বা বন্ধন থেকে এসেছে। আভিধানিক অর্থে এর দ্বারা এমন একটি দলকে বোঝানো হয়, যাদের একে অপরের সাথে শক্তিশালী মৈত্রী বা যোগসূত্র রয়েছে। সাধারণত ১০ থেকে

৪০ জন লোকের একটি দলকে 'উসবাহ' বলা হয়। যেহেতু এরা একজোট হয়ে কাজ করে বা একে অপরকে সমর্থন দেয়, তাই এদের এই নামে অভিহিত করা হয়।

উদ্দেশ্য ও পরিচয়:

এই আয়াতে 'উসবাহ' বা দল বলতে মদিনার ওই সব মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদারদের বোঝানো হয়েছে, যারা হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে জঘন্য 'ইফক' বা অপবাদ রটনায় লিপ্ত ছিল।

মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন, এই দলের নেতৃত্ব দিয়েছিল মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল। তার সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল মিসতাহ ইবনে উসাসা, হাসসান ইবনে সাবিত এবং হামনা বিনতে জাহাশ (রা.)। (উল্লেখ্য, সাহাবিরা মুনাফিক ছিলেন না, কিন্তু বিভ্রান্ত হয়ে এর সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং পরে শাস্তি ভোগ করে পবিত্র হয়েছিলেন)।

উপসংহার:

আল্লাহ তায়ালা তাদের 'উসবাহ' বা শক্তিশালী দল বলেছেন এজন্য যে, তারা খুব সংঘবদ্ধভাবে মদিনার সমাজে এই মিথ্যা খবরটি ছড়িয়ে দিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

---

১১০. আল্লাহ তায়ালার বাণী "ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم"-এর অর্থ ব্যাখ্যা কর। (بين معنى قوله تعالى "ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم")

উত্তর:

ভূমিকা:

ইফক বা অপবাদের ঘটনাটি ছিল মদিনার মুসলিম সমাজের জন্য এক চরম পরীক্ষার মুহূর্ত। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা অপবাদ রটনাকারীদের পরিচয় স্পষ্ট করে মুমিনদের সতর্ক করেছেন।

আয়াতের অর্থ:

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ

অর্থ: "নিশ্চয়ই যারা এই মিথ্যা অপবাদ (ইফক) রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল।"

ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য:

১. 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্য হতে): এই শব্দটির তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যে, নবীর স্ত্রীর বিরুদ্ধে এই জঘন্য কুৎসা রটনাকারীরা বাইরের কোনো শত্রু (যেমন—মক্কার কাফের বা ইহুদি) নয়। বরং তারা মদিনার মুসলিম সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত মানুষ। তারা বাহ্যত তোমাদের সাথেই নামাজ পড়ে এবং মেলামেশা করে।

২. অন্তর্নিহিত বিপদ: ঘরের শত্রু বিভীষণের মতো। বাইরের শত্রুর চেয়ে ঘরের ভেতরের শত্রু বেশি বিপজ্জনক। মুনাফিকরা মুসলিম নামধারী হয়ে ভেতরে থেকে ইসলাম ও নবীর পরিবারের সম্মানহানি করতে চেয়েছিল। আল্লাহ মুমিনদের জানিয়ে দিলেন যে, তোমাদের নিজেদের লোকরই একাংশ এই পাপে লিপ্ত।

৩. সান্ত্বনা ও শিক্ষা: এর মাধ্যমে নবীজি (সা.) ও আবু বকর (রা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, পুরো সমাজ নষ্ট হয়ে যায়নি, বরং একটি নির্দিষ্ট দুষ্ট চক্র (উসবাহ) এই কাজ করেছে।

উপসংহার:

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনদের সমাজকে আত্মশুদ্ধি অর্জন এবং মুনাফিকদের চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

---

১১১. নারীর জন্য স্থায়ীভাবে মাহরাম কারা? (من هم المحارم للمرأة؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামী শরিয়তে পর্দার বিধান কার্যকর করার জন্য 'মাহরাম' ও 'গায়রে মাহরাম'-এর পার্থক্য জানা অপরিহার্য। সূরা আন নূরের ৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নারীদের জন্য মাহরাম পুরুষদের একটি বিস্তারিত তালিকা প্রদান করেছেন, যাদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা বৈধ।

মাহরামের সংজ্ঞা:

'মাহরাম' (المحرم) হলো ওই সব পুরুষ আত্মীয়, যাদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নারীর জন্য চিরস্থায়ীভাবে হারাম (নিষিদ্ধ) এবং যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা বা পর্দা ছাড়া কথা বলা জায়েজ।

স্থায়ী মাহরামদের তালিকা (আয়াত অনুযায়ী):

১. পিতা ও ঊর্ধ্বতন পুরুষ: নিজের বাবা, দাদা, নানা এবং তার ওপরের সবাই।

২. শ্বশুর: স্বামীর পিতা, দাদা।

৩. পুত্র ও অধস্তন পুরুষ: নিজের ছেলে, ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে।

৪. স্বামীর পুত্র: স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান (সৎ ছেলে)।

৫. ভাই: আপন ভাই, বৈমাত্রেয় (সৎ মা) ভাই এবং বৈপিত্রেয় (সৎ বাবা) ভাই।

৬. ভাতিজা: ভাইয়ের ছেলে ও তার অধস্তন।

৭. ভাগিনা: বোনের ছেলে ও তার অধস্তন।

৮. দুধ সম্পর্কের আত্মীয়: দুধ ভাই, দুধ বাবা, দুধ ছেলে ইত্যাদি (হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত)।

(বি.দ্র: স্বামী মাহরাম নন, তবে তার সামনে পর্দা নেই; বরং তার জন্যই নারীর সৌন্দর্য)

উপসংহার:

এই নির্দিষ্ট তালিকা ছাড়া অন্য সকল পুরুষ (যেমন—চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই, দুলাভাই, দেবর) গায়রে মাহরাম। তাদের সামনে পূর্ণ পর্দা রক্ষা করা নারীর জন্য ফরজ।

---

১১২. الاستيذان শব্দের অর্থ কী? (ما معنى الاستيذان؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (Privacy) এবং পারিবারিক পবিত্রতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। অন্যের গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে 'ইস্তিজান' বা অনুমতি গ্রহণ ইসলামের এক মহান শিষ্টাচার, যা সূরা আন নূরে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

আভিধানিক অর্থ:

আরবি 'ইস্তিজান' (الاستئذان) শব্দটি 'ইজন' (إذن) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো—অনুমতি প্রার্থনা করা, আজ্ঞা চাওয়া বা সম্মতি চাওয়া।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

শরিয়তের পরিভাষায়, কারো ব্যক্তিগত বাসগৃহ, কক্ষ বা এমন কোনো স্থানে প্রবেশের পূর্বে গৃহকর্তা বা বাসিন্দার কাছে সালাম প্রদানপূর্বক ভেতরে প্রবেশের সম্মতি নেওয়াকে ইস্তিজান বলে।

তাৎপর্য:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "দৃষ্টির হেফাজতের জন্যই ইস্তিজানের বিধান দেওয়া হয়েছে।" অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে ঢুকলে ঘরের বাসিন্দারা অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকতে পারেন, যা দেখা আগন্তুক ও গৃহবাসী উভয়ের জন্যই লজ্জাজনক। তাই আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন:

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا

অর্থ: "তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারো গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নাও (এবং নিজেদের পরিচয় দিয়ে তাদের আতঙ্ক দূর করো)।"

উপসংহার:

ইস্তিজান কেবল একটি ভদ্রতা নয়, বরং এটি মুমিনের ঈমানি দায়িত্ব। অনুমতি না পেলে ফিরে আসাই হলো এই বিধানের দাবি।

১১৩. সালামের বিধান ও এর জবাবের হুকুম কী? (ما هو حكم السلام وجوابه؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

মুসলিম ভ্রাতৃত্ববন্ধনের অন্যতম নিদর্শন হলো সালাম। সূরা আন নূরের ২৭ ও ৬১ নম্বর আয়াতে ঘরে প্রবেশের সময় সালাম দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফিকহুল ইসলামিতে সালাম দেওয়া ও উত্তর দেওয়ার সুনির্দিষ্ট হুকুম রয়েছে।

সালাম দেওয়ার বিধান:

কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে বা কারো ঘরে প্রবেশের সময় প্রথমে সালাম দেওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অত্যন্ত পছন্দনীয় আমল। আল্লাহ বলেন:

فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً

অর্থ: "তোমরা একে অপরকে সালাম দেবে; এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বরকতময় ও পবিত্র অভিবাদন।" (সূরা নূর: ৬১)

সালামের জবাব দেওয়ার বিধান:

সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব (আবশ্যক)।

- যদি সালাম কোনো একক ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, তবে তার উত্তর দেওয়া 'ফরজে আইন' বা ব্যক্তিগত ওয়াজিব।
- আর যদি কোনো দল বা জামাতকে সালাম দেওয়া হয়, তবে তাদের মধ্য থেকে একজন উত্তর দিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে, একে 'ওয়াজিবে কিফায়া' বলা হয়। কিন্তু কেউ উত্তর না দিলে সবাই গুনাহগার হবে।

নিয়ম:

আল্লাহর নির্দেশ হলো, কেউ সালাম দিলে তার চেয়ে উত্তমভাবে বা অন্তত সমপরিমাণ বাক্যে উত্তর দিতে হবে (সূরা নিসা: ৮৬)।

উপসংহার:

সালাম সমাজে শান্তি ও ভালোবাসা ছড়ায়। তাই মুমিনদের উচিত সালামের প্রচলন বাড়ানো এবং শুদ্ধভাবে উত্তর দেওয়া।

---

১১৪. আল্লাহ তায়ালার বাণী "بيوتا غير مسكونة"-এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? (ما المراد بقوله تعالى "بيوتا غير مسكونة"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

অন্যের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে এমন অনেক স্থানে যেতে হয় যেখানে অনুমতি নেওয়া কঠিন বা অসম্ভব। সূরা আন নূরের ২৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এমন স্থানের হুকুম শিথিল করেছেন।

আয়াতের অর্থ:

আল্লাহ তায়ালা বলেন: لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ

অর্থ: "তোমাদের জন্য কোনো পাপ নেই যদি তোমরা এমন ঘরসমূহে প্রবেশ করো, যা বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট নয় (জনবসতিহীন)।"

উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

'বসবাসহীন গৃহ' বা 'গাইরে মাসকুনাহ' দ্বারা ওই সব স্থানকে বোঝানো হয়েছে, যা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা পরিবারের একান্ত বসবাসের জন্য নয়, বরং তা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত। যেমন:

১. জনকল্যাণমূলক স্থান: সরাইখানা, মুসাফিরখানা, মসজিদ, বা রাস্তার ধারের বিশ্রামাগার।

২. বাণিজ্যিক স্থান: দোকানপাট, শপিং মল, বাজার, গুদামঘর বা স্নানাগার।

৩. পরিত্যক্ত স্থান: এমন ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি যেখানে কেউ থাকে না, কিন্তু সেখানে পথচারীর আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

তাৎপর্য:

যেহেতু এসব স্থানে মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা 'আউরাত' ক্ষুণ্ন হওয়ার ভয় নেই এবং সেখানে মানুষের পণ্যসামগ্রী বা স্বার্থ জড়িত থাকে, তাই আল্লাহ তায়ালা এখানে প্রবেশের জন্য অনুমতির শর্ত তুলে দিয়েছেন।

উপসংহার:

ইসলাম একটি বাস্তবসম্মত ধর্ম। গোপনীয়তা রক্ষার স্থানের জন্য যেমন কঠোর নিয়ম দিয়েছে, তেমনি প্রয়োজন্যীয় ক্ষেত্রে মানুষের সুবিধা নিশ্চিত করতে নিয়ম শিথিল করেছে।

---

১১৫. কোন সনে হিজাব ফরজ করা হয়েছিল? (فى اى سنة فرض الحجاب؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় হিজাব বা পর্দা একটি ফরজ বিধান। মক্কী জীবনে মুসলমানরা নির্যাতিত থাকায় এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তখনো পর্দার হুকুম নাযিল হয়নি। মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই বিধান আসে।

হিজাব ফরজ হওয়ার সময়কাল:

ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, হিজাব বা পর্দার বিধান ৫ম হিজরি সনে নাযিল হয়।

বেশিরভাগ বর্ণনায় পাওয়া যায়, এটি ৫ম হিজরীর জিলকদ মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

প্রেক্ষাপট:

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন হযরত জয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)-কে বিবাহ করেন, সেই বিবাহের ওয়ালিমা বা ভোজের দিন পর্দার আয়াত নাযিল হয়। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, কিছু সাহাবি খাওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ বসে গল্প করছিলেন, যা নবীজি (সা.)-এর জন্য কষ্টদায়ক ছিল কিন্তু তিনি লজ্জায় কিছু বলছিলেন না। তখন আল্লাহ তায়ালা সূরা আহযাবের ৫৩ নম্বর আয়াত নাযিল করেন, যেখানে

পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সূরা আন নূরে পর্দার বিস্তারিত বিধান (যেমন—দৃষ্টি সংযত রাখা, ওড়না ব্যবহার) নাযিল হয়।

উপসংহার:

৫ম হিজরিতে পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার মাধ্যমে মুসলিম নারী ও পুরুষের সামাজিক মেলামেশার সীমারেখা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হয়, যা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

---

১১৬. حجاب-এর অর্থ কী? (ما معنى الحجاب؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

বর্তমান বিশ্বে 'হিজাব' একটি বহুল আলোচিত শব্দ। এটি কেবল নারীদের পোশাক নয়, বরং এটি ইসলামের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির প্রতীক। সূরা আন নূর ও সূরা আহযাবে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

আভিধানিক অর্থ:

আরবি 'হিজাব' (الحجاب) শব্দটি 'হাজব' (حجب) মূলধাতু থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো—

১. পর্দা বা আড়াল: যা দুই বস্তুর মাঝখানে ব্যবধান সৃষ্টি করে।

২. প্রতিবন্ধক বা অন্তরায়: যা এক পক্ষকে অন্য পক্ষ থেকে ঢেকে রাখে।

৩. আবরণ বা আচ্ছাদন: যা কোনো কিছুকে লুকিয়ে রাখে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায়, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নারী (এবং পুরুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য সীমার মধ্যে) কর্তৃক শরিয়ত নির্ধারিত পন্থায় গায়রে মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) পুরুষদের দৃষ্টি থেকে নিজের শরীর, রূপ-সৌন্দর্য ও অলঙ্কার আবৃত রাখা এবং অবাধ মেলামেশা থেকে নিজেকে বিরত রাখাকে হিজাব বলে।

হিজাবের পরিধি:

হিজাব কেবল কাপড় দিয়ে শরীর ঢাকার নাম নয়। এর মধ্যে দৃষ্টি সংযত রাখা (গাদ্বদে বাশার), কণ্ঠস্বর নিচু রাখা, সুগন্ধি ব্যবহার না করা এবং শালীন চলাফেরা—সবই অন্তর্ভুক্ত।

উপসংহার:

হিজাব নারীর বন্দিত্ব নয়, বরং এটি তার সুরক্ষা ও সম্মানের প্রতীক। এটি সমাজকে অশ্লীলতা ও ফিতনা থেকে রক্ষা করে।

---

১১৭. আল্লাহ তায়ালার বাণী "ويحفظوا فروجهم"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (ما المراد بقوله تعالى "ويحفظوا فروجهم"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আন নূরের ৩০ ও ৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিন পুরুষ ও নারীদের দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশের পরপরই লজ্জাস্থান হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এটি চারিত্রিক পবিত্রতার মূল ভিত্তি।

আয়াতের অর্থ:

আল্লাহ তায়ালা বলেন: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

অর্থ: "মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।"

উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

মুফাসসিরিনে কেরাম 'লজ্জাস্থানের হেফাজত'-এর দুটি প্রধান অর্থের কথা উল্লেখ করেছেন:

১. ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা: এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো জিনা বা অবৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করা। লজ্জাস্থানকে কেবল হালাল ক্ষেত্র

(বিবাহিত স্ত্রী) ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখা। একে চারিত্রিক পবিত্রতা বা 'ইফফাত' বলা হয়।

২. সতর ঢাকা: এর দ্বিতীয় অর্থ হলো লজ্জাস্থান বা সতর আবৃত রাখা। অর্থাৎ, নিজের লজ্জাস্থান বা শরীরের গোপন অঙ্গ অন্য কারো সামনে উন্মুক্ত না করা (স্ত্রী ছাড়া)। এটি পর্দার অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমার স্ত্রী ছাড়া অন্যদের সামনে তোমার লজ্জাস্থান হেফাজত করো।"

তাৎপর্য:

চোখ হলো মনের জানালা। কুদৃষ্টির কারণেই মানুষ জিনার দিকে ধাবিত হয়। তাই আল্লাহ প্রথমে চোখ হেফাজত করতে বলেছেন, তারপর লজ্জাস্থান হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ যে চোখ সামলাতে পারে, তার জন্য চরিত্র রক্ষা করা সহজ।

উপসংহার:

লজ্জাস্থানের হেফাজত মুমিনের জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম জামিনদার। রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে আমাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী (জিহ্বা) এবং দুই উরুর মধ্যবর্তী (লজ্জাস্থান) অঙ্গের জিম্মাদারি দেবে, আমি তাকে জান্নাতের জিম্মাদারি দেব।"

---

১১৮. আল্লাহ তায়ালার বাণী "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ"-এর ব্যাখ্যা কর। (فسر قوله تعالى "الله نور السموات والارض")

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আন নূরের ৩৫ নম্বর আয়াতটি পবিত্র কুরআনের অন্যতম গভীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজের সত্তাকে 'নূর' বা জ্যোতির সাথে তুলনা করে এক অনন্য উপমা পেশ করেছেন। মুফাসসিরিনে কেরাম এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আয়াতের অর্থ:

“আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের নূর (জ্যোতি)।”

তাফসীর ও ব্যাখ্যা:

১. হেদায়েতকারী (আল-হাদি): রইসুল মুফাসসিরিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, এখানে ‘নূর’ শব্দের অর্থ হলো হেদায়েতকারী বা পথপ্রদর্শক। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিনবাসীকে সত্য পথের দিশা দেন। তাঁর হেদায়েতের আলো ছাড়া মহাবিশ্বের সবকিছু গোমরাহির অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকত। তিনি মুমিনের অন্তরকে ঈমানের নূর দিয়ে আলোকিত করেন।

২. অস্তিত্বদানকারী (আল-মুজিদ): ইমাম গাজ্জালি (রহ.) ও দার্শনিকদের মতে, নূর বলা হয় যা নিজে প্রকাশিত এবং অন্যকে প্রকাশ করে। আল্লাহ তায়ালা নিজে চিরঞ্জীব এবং তিনি অস্তিত্বহীন জগতকে অস্তিত্ব দান করে আলোকিত করেছেন। অর্থাৎ, আসমান-জমিনের প্রতিটি অণু-পরমাণুর অস্তিত্ব আল্লাহর নূরেরই প্রতিফলন।

৩. ব্যবস্থাপক (আল-মুদাব্বির): কেউ কেউ বলেন, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের যে বাহ্যিক আলো আমরা দেখি, তা আল্লাহরই সৃষ্টি। তিনি এই আলো দিয়ে জগতকে আলোকিত ও সুশৃঙ্খল রেখেছেন।

উপসংহার:

মূলত এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহই সমস্ত আলোর উৎস—চাই তা বাহ্যিক আলো হোক কিংবা অন্তরের ঈমানি আলো।

---

১১৯. আল্লাহ তায়ালার বাণী "نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ"-এর ব্যাখ্যা কর। (اشرح قوله تعالى "نور على نور")

উত্তর:

ভূমিকা:

‘আয়াতুন নূর’-এর শেষাংশে আল্লাহ তায়ালা মুমিনের অন্তরে ঈমানের আলো প্রজ্জ্বলিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি বোঝাতে গিয়ে এই চমৎকার বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। এটি হেদায়েতের পূর্ণতার প্রতীক।

আয়াতের অর্থ:

“নূরের ওপর নূর” বা “জ্যোতির ওপর জ্যোতি।”

তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা:

মুফাসসিরিনে কেরাম ‘নূরুন আলা নূর’-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটি মূলত দুটি নূরের মিলনকে নির্দেশ করে:

১. ফিতরাত ও ওহী: মানুষের জন্মের সময় আল্লাহ তাকে এক ধরনের স্বচ্ছ বিবেক-বুদ্ধি বা স্বভাবজাত ধর্ম (ফিতরাত) দিয়ে পাঠান। এটি একটি নূর বা আলো। এরপর যখন সে বড় হয় এবং তার কাছে কুরআনের ওহী বা শরিয়তের জ্ঞান আসে, তখন সেই ওহীর নূর ফিতরাতের নূরের সাথে মিলিত হয়। তেল যেমন আগুন পেলেই জ্বলে ওঠে, তেমনি মুমিনের ফিতরাত ওহী পেলেই হেদায়েতের পথে জ্বলে ওঠে। একেই বলা হয়েছে নূরের ওপর নূর।

2. ঈমান ও আমল: কারও কারও মতে, মুমিনের অন্তরের বিশ্বাস (ঈমান) একটি নূর। আর তার নেক আমল বা সৎকর্ম আরেকটি নূর। ঈমানের সাথে যখন আমল যুক্ত হয়, তখন তা পরিপূর্ণ আলোয় পরিণত হয় এবং এই আলো দিয়েই সে পুলসিরাত পার হবে।

উপসংহার:

এই আয়াতাংশ প্রমাণ করে যে, আল্লাহর হেদায়েত প্রাপ্তি এবং তাতে অটল থাকা একটি ধারাবাহিক আলোকিত প্রক্রিয়া। আল্লাহ যাকে চান, তাকে এই দ্বিগুণ নূরের অধিকারী করেন।

---

১২০. بيع-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? (ما معنى البيع لغة وشرعا؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আন নূরের ৩৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এমন কিছু মানুষের প্রশংসা করেছেন, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল করতে পারে না।

এখানে 'বাই' (البيع) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিতে এই শব্দটির গুরুত্ব অপরিসীম।

আভিধানিক অর্থ:

আরবি 'বাই' (الْبَيْعُ) শব্দটি 'বাআ' (ب ا ع) ধাতু থেকে এসেছে। আভিধানিক অর্থে এর অর্থ হলো—বিনিময় করা, বেচাকেনা করা, হাত মিলানো বা চুক্তি করা। যেহেতু প্রাচীনকালে কেনাবেচার সময় ক্রেতা-বিক্রেতা হাত মিলিয়ে চুক্তি পাকা করত, তাই একে বাই বলা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায়:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ بِالتَّرَاضِي

অর্থ: "পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে এক মালের বিনিময়ে অন্য মালের মালিকানা স্বত্ব পরিবর্তন করাকে বাই বা ক্রয়-বিক্রয় বলে।"

এটি হালাল হওয়ার জন্য পণ্যটি বৈধ হতে হবে, মূল্য নির্ধারিত হতে হবে এবং উভয় পক্ষের সম্মতি থাকতে হবে।

সূরার প্রেক্ষাপট:

সূরা আন নূরে আল্লাহ মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তারা 'বাই' বা ব্যবসায় লিপ্ত থেকেও সালাত ও যাকাতের কথা ভোলে না। অর্থাৎ, জীবিকার প্রয়োজনে হালাল ব্যবসা করা ইবাদতেরই অংশ, যদি তা আল্লাহর হুকুম পালনে বাধা না হয়।

উপসংহার:

'বাই' বা ব্যবসা ইসলামে একটি হালাল ও বরকতময় পেশা। তবে তা হতে হবে শরিয়তসম্মত এবং ধোঁকাবাজিমুক্ত।

১২১. رزق-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? (ما معنى الرزق لغة وشرعا؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আন নূরের ৩৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের 'বিনা হিসেবে' রিজিক দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। 'রিজিক' শব্দটি মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর সঠিক ধারণা রাখা আকিদার অংশ।

আভিধানিক অর্থ:

'রিজিক' (الرِّزْقُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো—দান, উপহার, নসিব, বৃত্তি, বা এমন বস্তু যা দ্বারা উপকার লাভ করা যায়। কখনো কখনো নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যকেও রিজিক বলা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা অনুযায়ী:

الرِّزْقُ هُوَ مَا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَى الْحَيَوَانِ فَيَنْتَفِعُ بِهِ

অর্থ: "আল্লাহ তায়ালা প্রাণীর জীবন ধারণ ও উপকারের জন্য যা কিছু বরাদ্দ করেছেন এবং যা ভোগ করা যায়—চাই তা হালাল হোক বা হারাম—তাকে রিজিক বলে।"

অর্থাৎ, খাদ্য, পানীয়, পোশাক, বাসস্থান, জ্ঞান, স্বাস্থ্য, হায়াত—সবই রিজিকের অন্তর্ভুক্ত।

তাৎপর্য:

আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম হলো 'আর-রাজ্জাক' বা মহারিজিদাতা। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর রিজিক আল্লাহর জিম্মায়। মানুষ তার তাকদিরে লেখা রিজিক শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। হালাল রিজিক বরকতপূর্ণ এবং ইবাদত কবুলের শর্ত, তবে হারাম বস্তুও ব্যাপক অর্থে আল্লাহর দেওয়া তাকদরি রিজিকের অন্তর্ভুক্ত (যদিও তা ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ)।

উপসংহার:

রিজিক কেবল টাকাপয়সা নয়, বরং যা কিছু মানুষের উপকারে আসে, তাই আল্লাহর দেওয়া রিজিক।

---

১২২. হারাম জিনিস রিজিক হওয়ার বিষয়ে আলেমগণের অভিমত উল্লেখ কর। (اذكر اقوال العلماء فى كون الحرام رزقا)

উত্তর:

ভূমিকা:

'রিজিক' শব্দের সংজ্ঞায় হালাল ও হারামের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকদের (মুতাকাল্লিমিন) মধ্যে একটি সূক্ষ্ম মতভেদ রয়েছে। বিশেষ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং মু'তারজিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে এ নিয়ে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়।

আলেমগণের অভিমত:

১. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত:

তাদের মতে, হারাম বস্তুও রিজিকের অন্তর্ভুক্ত।

যুক্তি: আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি প্রাণীর জন্য যা বরাদ্দ করেছেন, তা-ই রিজিক। একজন চোর বা ডাকাত হারাম খাবার খেয়েই জীবন ধারণ করে এবং পুষ্টি পায়। যদি বলা হয় হারাম রিজিক নয়, তবে প্রশ্ন আসবে—সে কার দেওয়া খাবার খেয়ে বেঁচে আছে? আল্লাহ ছাড়া তো কোনো রাজ্জাক নেই। তাই হারামও আল্লাহর দেওয়া রিজিক, কিন্তু তা উপার্জন বা ভক্ষণ করার জন্য আল্লাহ মানুষকে নিষেধ করেছেন এবং এর জন্য শাস্তি দেবেন।

২. মু'তারজিলা সম্প্রদায়:

তাদের মতে, হারাম বস্তু রিজিক হতে পারে না।

যুক্তি: তারা বলে, রিজিক হলো আল্লাহর দান এবং অনুগ্রহ। আল্লাহ কখনো বান্দাকে হারাম বা মন্দ বস্তু দান করতে পারেন না। তাই হারাম খাদ্য আল্লাহর রিজিক নয়, বরং এটি শয়তানি বা মানুষের অবৈধ দখল। তাদের সংজ্ঞায়, 'রিজিক হলো এমন বস্তু যার মালিকানা বৈধ এবং যা ভক্ষণ করা নিষেধ নয়।'

উপসংহার:

আহলে সুন্নাতের মতটিই অধিক বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত। কারণ রিজিক মানে যা দিয়ে জীবন চলে। হারাম খেয়েও মানুষের জীবন চলে, তাই সৃষ্টিগতভাবে তা রিজিক, কিন্তু শরিয়তগতভাবে তা নিষিদ্ধ।

---

১২৩. نفاق-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? (ما معنى النفاق لغة وشرعا؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আন নূরে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র এবং ইফকের ঘটনায় তাদের ভূমিকার কথা আলোচিত হয়েছে। 'নিফাক' হলো ঈমানের বিপরীত এবং ইসলামের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি ব্যাধি।

আভিধানিক অর্থ:

আরবি 'নিফাক' (النِّفَاقُ) শব্দটি 'নাফাক' (نفق) মূলধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ—

১. সুরঙ্গ বা গর্ত: মাটির নিচে এমন সুরঙ্গ যার একদিক দিয়ে ঢোকা যায় এবং অন্যদিক দিয়ে বের হওয়া যায়।

২. ইঁদুরের গর্ত: মরুভূমির ইঁদুর (যারবু) তার গর্তের দুটি মুখ রাখে। বিপদ দেখলে একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে পালায়। একে 'নাফিকা' বলা হয়। মুনাফিকরাও ইসলামে একদিক দিয়ে ঢোকে এবং অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে যায়।

৩. শেষ হয়ে যাওয়া বা ব্যয় হওয়া: যেমন 'নাফাকাতু' (ব্যয়)।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

শরিয়তের পরিভাষায়:

إِظْهَارُ الْإِسْلَامِ وَالْخَيْرِ وَإِبْطَانُ الْكُفْرِ وَالشَّرِّ

অর্থ: "অন্তরে কুফরি, অবিশ্বাস বা শত্রুতা গোপন রেখে বাহ্যিকভাবে মুখে ঈমান ও ইসলামের প্রকাশ ঘটাকেই 'নিফাক' বলে।"

যে ব্যক্তি এমন দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে, তাকে 'মুনাফিক' বলা হয়।

তাৎপর্য:

নিফাক দুই প্রকার—বিশ্বাসগত (আকিদাগত) এবং কর্মগত। আকিদাগত মুনাফিকরা কাফেরদের চেয়েও অধম এবং তারা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।

উপসংহার:

নিফাক হলো অন্তরের কপটতা। এটি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্যান্সারের মতো। সূরা নূরের অন্যতম শিক্ষা হলো নিফাক থেকে মুক্ত হয়ে খাঁটি মুমিন হওয়া।

---

১২৪. صلوة-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? (ما معنى الصلوة لغة وشرعا؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আন নূরের ৪১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, আসমান ও জমিনের সবাই আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে এবং পাখিরাও তাদের 'সালাত' ও তাসবিহ জানে। এছাড়া মুমিনদের সালাত কায়েমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আভিধানিক অর্থ:

'সালাত' (الصَّلَاةُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ—

১. দোয়া বা প্রার্থনা (Ad-Dua): এটিই সালাতের মূল অর্থ।

২. ক্ষমা প্রার্থনা (Istighfar): গুনাহ মাফের আবেদন।

৩. রহমত (Rahmat): আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত মানে রহমত।

৪. প্রশংসা: ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সালাত মানে মুমিনদের জন্য দোয়া ও প্রশংসা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

শরিয়তের পরিভাষায়:

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مَفْتُتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ وَمُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ

অর্থ: "নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে, তাকবিরে তাহরিমা দ্বারা শুরু এবং সালাম ফেরানোর মাধ্যমে শেষ—বিশেষ কথা (কুরআন পাঠ, তাসবিহ) ও কাজের (রুকু, সিজদা) সমষ্টিকে সালাত বলে।"

তাৎপর্য:

সালাত হলো বান্দা ও রবের মধ্যকার সংযোগ সেতু। এটি মানুষকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে (যেমনটি সূরা আনকাবুতে বলা হয়েছে)।

উপসংহার:

সালাত বা নামাজ ইসলামের প্রধান স্তম্ভ। মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্যকারী রেখা হলো এই সালাত।

---

১২৫. আল্লাহ তায়ালার বাণী "وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ"-এর ব্যাখ্যা কর। (اشرح قوله تعالى "والله خلق كل دابة من ماء")

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আন নূরের ৪৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃজনী শক্তির এক বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক সত্য প্রকাশ করেছেন। ১৪০০ বছর আগে যখন বিজ্ঞানের এত উন্নতি ছিল না, তখন কুরআন জীবজগতের উৎস সম্পর্কে এই তথ্য দিয়েছে।

আয়াতের অর্থ:

"এবং আল্লাহ সমস্ত বিচরণশীল প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

তাফসীর ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা:

১. জীবের মূল উপাদান: আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করছেন যে, প্রতিটি 'দাব্বাহ' বা বুকে ভর দিয়ে চলা প্রাণীসহ সব প্রাণীর সৃষ্টির মূল উপাদান হলো পানি।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, জীবকোষের (Cell) মূল উপাদান প্রোটোপ্লাজমের ৮০-৯০ শতাংশই পানি। পানি ছাড়া পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না।

২. প্রজনন প্রক্রিয়া: অনেক তাফসীরকারক বলেন, এখানে পানি দ্বারা 'বীর্য' বা 'শুক্র' (Nutfah) বোঝানো হয়েছে। কারণ অধিকাংশ প্রাণীর জন্ম নারী-পুরুষের মিলনে নির্গত তরল পানি থেকেই হয়।

৩. বৈচিত্র্য: একই পানি থেকে সৃষ্টি হয়েও প্রাণীগুলো কত ভিন্ন! কেউ পেটে ভর দিয়ে চলে (সাপ), কেউ দুই পায়ে চলে (মানুষ, পাখি), আবার কেউ চার পায়ে চলে (পশু)। এই বৈচিত্র্য আল্লাহর অসীম কুদরতের প্রমাণ।

উপসংহার:

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং তিনিই একমাত্র স্রষ্টা যিনি এক ফোঁটা পানিকে বিচিত্র সব প্রাণীতে রূপান্তর করতে পারেন। এটি চিন্তাশীলদের জন্য এক বিশাল নিদর্শন।